2.5 GEO-A-CC-2-03-TH – Human Geography ✧ 60 Marks / 4 Credits

Unit I: Nature and Principles

1. Nature, scope and recent trends. Elements of human geography [4]
2. Approaches to Human Geography: Resource, locational, landscape, environment [6]
3. Concept and classification of race. Ethnicity [5]
4. Space, society and cultural regions (language and religion) [5]

Unit II: Society, Demography and Ekistics

5. Evolution of human societies: Hunting and food gathering, pastoral nomadism, subsistence farming and industrial society [6]
6. Human adaptation to environment: Case studies of Eskimo, Masai and Maori [4]
7. Population growth and distribution, composition; demographic transition [5]
8. Population–resource regions (Ackerman) [5]
9. Development–environment conflict [5]
10. Types and patterns of rural settlements [5]
11. Rural house types in India [5]
12. Morphology and hierarchy of urban settlements [5]

References

মানবীয় ভূগোল

Human Geography

(CBCS Syllabus)

ড. অজিতকুমার শীল

মানবীয় ভূগোলের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি (Recent Trends in Human Geography) ঃ

মানবীয় ভূগোলের আলোচনায় সাম্প্রতিককালে নতুন নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে এবং [illegible] সম্পর্কের আলোচনার ধরনেও পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

পাঁচ ও ছয়ের দশকে **মাত্রিক বিপ্লবের (Quantitative Revolution)** অন্তর্ভুক্তি মানবীয় ভূগোলের আলোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ৭-এর দশকে **মূলক ভূগোল (Radical Geography)** [illegible] হয়। ২০ শতকের শেষদিকে এবং ২১ শতকে **কল্যাণমূলক ভূগোল (Welfare Geography)**, **মানবতাবাদী ভূগোল (Humanistic Geography)** বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়। সাম্প্রতিক আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলির আলোচনা অন্তর্ভুক্তি এই উপ-বিষয়গুলির জনপ্রিয়তার কারণ।

মানবীয় ভূগোল বর্তমানে কেবল জনসংখ্যার বণ্টন, ঘনত্ব ও বৃদ্ধি এবং প্রব্রজন ইত্যাদির আলোচনায় নয়। প্রজনন ও মরণশীলতার পাশাপাশি **মানব উন্নয়নসূচক (Human Development Index)**, **লিঙ্গ উন্নয়নসূচক (Gender Development Index)**, **বহুধা দারিদ্র্যসূচক (Multiple Poverty Index)** ইত্যাদির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

বিশ্বায়ন (Globalisation)-এর প্রভাব এবং স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে তার সংঘাত ও সমন্বয়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানবীয় ভূগোলের আলোচনায় এটি যুক্ত হয়েছে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)-এর ধারণা এবং কীভাবে এটি অর্জিত হবে তাও মানবীয় ভূগোলে বিবেচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে **পরিবেশের ধারণ সামর্থ (Carrying Capacity of Environment)**, পরিবেশে মানুষের কার্যকলাপের ফলে **দূষণজনিত সমস্যা** এবং তার সমাধানের বিষয়গুলি চর্চিত হয়।

মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহ (Elements of Human Geography) ঃ

মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহকে **ফ্লিঞ্চ (Flinch)** ও **ট্রিওয়ার্থা (Trewartha)** একটি তালিকাক্রম অনুসারে দেখিয়েছেন। এটি নিম্নরূপ ঃ

মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহ (After Finch & Trewartha)

প্রাকৃতিক উপকরণ	জনসংখ্যা	সাংস্কৃতিক উপকরণ
ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ, জলভাগের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু	বৃদ্ধি, বণ্টন, ঘনত্ব, প্রব্রজন ও গঠন	জনবসতি, কৃষি, শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি

সমাজ ভূগোলের আলোচনায় বিশেষীকরণ দেখা গেছে কল্যাণমূলক ভূগোল ও মানবতাবাদী ভূগোল রচনার মধ্য দিয়ে। **কল্যাণমূলক ভূগোল (Welfare Geography)**-এ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে সামাজিক সমস্যাসমূহ দূর করা ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রভাব আলোচনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

মানবতাবাদী ভূগোল (Humanistic Geography)-এ মানুষের সৃজনশীলতা, বিচারবোধ, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন, আদর্শ ও মূল্যবোধ, পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন এবং মানুষের আত্মসচেতনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের পরিবর্তে সমষ্টিগত উন্নয়ন, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরীখে সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন, পরিসর (Space)-এর চেয়ে স্থানীক (Place) মূল্যায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মানবীয় ভূগোলের সাম্প্রতিক গতি-প্রকৃতি (Recent Trends in Human Geography) ঃ

মানবীয় ভূগোলের আলোচনায় সাম্প্রতিককালে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা হয়েছে এবং প্রথাগত বিষয় সম্পর্কের আলোচনার ধরনেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

পাঁচ ও ছয়ের দশকে **মাত্রিক বিপ্লবের (Quantitative Revolution)** অবতারণা মানবীয় ভূগোলের আলোচনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ৭-এর দশকে **মূলক ভূগোল (Radical Geography)** জনপ্রিয় হয়। ২০ শতকের শেষদিকে এবং ২১ শতকে **কল্যাণমূলক ভূগোল (Welfare Geography), মানবতাবাদী ভূগোল (Humanistic Geography)** বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়। সাম্প্রতিক আর্থ-সমাজিক সমস্যাসমূহের আলোচনা অন্তর্ভুক্তি এই উপ-বিষয়গুলির জনপ্রিয়তার কারণ।

মানবীয় ভূগোল বর্তমানে কেবল জনসংখ্যার বন্টন, ঘনত্ব ও বৃদ্ধি এবং প্রব্রজন ইত্যাদির আলোচনা নয়। প্রজনন ও মরনশীলতার পাশাপাশি **মানব উন্নয়নসূচক (Human Development Index), লিঙ্গ উন্নয়নসূচক (Gender Development Index), বহুধা-দারিদ্রসূচক(Multiple Poverty Index)** ইত্যাদির আলোচনা প্রযুক্ত হয়েছে।

বিশ্বায়ন (Globalisation) -এর প্রভাব এবং স্থানীয় পরিস্থিতির সংগে তার সংঘাত ও সমঝোতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং মানবীয় ভূগোলের আলোচনায় এটি যুক্ত হয়েছে।

স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development)-এর ধারণা এবং কীভাবে এটি অর্জিত হবে তাও মানবীয় ভূগোলে বিবেচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে **পরিবেশের ধারণ সামর্থ** (Carrying Capacity of Environment), পরিবেশে মানুষের কার্যকলাপের ফলে **দূষণজনিত সমস্যা** এবং তার সমাধানের বিষয়ভঙ্গি চর্চিত হয়।

মানবীয় ভূগোলের আলোচনায় বিশেষীকরণ দেখা গেছে কল্যাণমূলক ভূগোল ও মানবতাবাদী ভূগোল রচনার মধ্য দিয়ে। **কল্যাণমূলক ভূগোল (Welfare Geography)**-এ সমসাময়িক পেক্ষাপটে সামাজিক সমস্যাসমূহ দূর করা ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রভাব আলোচনায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

মানবতাবাদী ভূগোল (Humanistic Geography)-এ মানুষের সৃজনশীলতা, বিচারবোধ, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতিতে তার প্রতিফলন, আদর্শ ও মূল্যবোধ, পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন এবং মানুষের আত্মসচেতনা ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের পরিবর্তে সমষ্টিগত উন্নয়ন, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার নিরীখে সামাজিক বাস্তবতা অনুধাবন, পরিসর (Space)-এর চেয়ে স্থানীক (Place) মূল্যায়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহ
(Elements of Human Geography)

মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহকে ফ্লিঞ্চ (Flinch) ও ট্রিওয়ার্দা (Trewartha) একটি তালিকার অনুসারে দেখিয়েছেন। এটি নিম্নরূপ ঃ

মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহ (After Finch & Trewartha)

প্রাকৃতিক উপকরণ	জনসংখ্যা	সাংস্কৃতিক উপকরণ
ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, খনিজ, জলভাগের স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও জীবজন্তু	বৃদ্ধি, বন্টন, ঘনত্ব, প্রব্রজন ও গঠন	জনবসতি, কৃষি, শ্রমশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি

বর্তমানে মানবীয় ভূগোলের উপাদানসমূহকে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভিন্নতায় বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবরূপে আলোচনা করা হল।

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical Environment) ঃ

নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism)অনুযায়ী বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণগুলি মানুষের ওপর নির্দিষ্ট প্রভাব ফেলে এবং তার জীবন ও জীবিকা কি হবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। হান্টিংটন, মিস্ সেম্পল (Miss Semple) প্রমুখ এই ধারণা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। অপরপক্ষে সম্ভাবনাবাদ (Possibilism)-এর সমর্থকগণ যেমন— ব্রুনেস, সয়ার প্রমুখ মনে করতেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ নানাবিধ সম্ভাবনা তৈরী করে। মানুষ সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে তার জীবন ও জীবিকা গড়ে তোলে।

- **মানবীয় ভূগোলের প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ (Physical Elements of Human Geography):**

প্রাকৃতিক যে উপদানগুলি মানুষের জীবনযাপন প্রণালীতে বিভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে সেগুলি নিম্নরূপঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ	[১] ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location)
	[২] ভূ-প্রকৃতি (Topography)
	[৩] আভ্যন্তরীণ জলভাগসমূহ(Internal Waterbodies)
	[৪] উপকূলভাগ (Coastline)
	[৫] জলবায়ু (Climate)
	[৬] মাটি (Soil)
	[৭] স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Natural Vegetation)
	[৮] জীবজন্তু (Animals)
	[৯] খনিজ (Minerals)

উক্ত উপকরণগুলি মিলিয়েই প্রাকৃতিক পরিবেশ গঠিত হয় যে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতায় মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মধ্যে ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। মানবীয় ভূগোলের এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলি আলোচনা করা হল।

[১] ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location) ঃ

ভূ-পৃষ্ঠের কোন স্থানে অবস্থানকে **ভৌগোলিক অবস্থান**। এই ভৌগোলিক অবস্থান — (ক) অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান এবং (খ) সমুদ্র থেকে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান এই দু'ভাবে আলোচনা করা হয়।

[ক] অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান ঃ অক্ষাংশ ভেদে সূর্যরশ্মির পতনকোণের তারতম্য হয়। নিরক্ষরেখা থেকে যত মেরুর দিকে যওয়া যায় সূর্যরশ্মি তত তির্যকভাবে পড়ে এবং উষ্ণতা হ্রাস পায়। অক্ষাংশের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান নিম্নলিখিত প্রভাব ফেলে ঃ—

(i) পৃথিবী কতকগুলি **তাপমণ্ডলে** বিভক্ত হয়। এর ভিত্তিতে নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অঞ্চলসমূহ বা দুই ক্রান্তীরেখার মধ্যবর্তী অংশ **উষ্ণমণ্ডল** (Torrid Zone), দুই ক্রান্তীরেখা থেকে মেরুবৃত্তের কাছাকাছি পর্যন্ত (প্রায় ৬৬ ১/২° পর্যন্ত) অংশ **নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল** (Temperate Zone) এবং মেরু বিন্দু পর্যন্ত অবশিষ্ট অংশ (৬৬ ১/২°—৯০°) **হিমমণ্ডল** নামে পরিচিত।

(ii) **অক্ষাংশের পার্থক্যে** জলবায়ু বিভিন্ন হয় এবং তা মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ— নিম্ন অক্ষাংশে ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের, উষ্ণ তৃণভূমির বা ক্রান্তীয় শুষ্ক মরু অঞ্চলের পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায়। ঘন বনভূমি, হিংস্র শ্বাপদ ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া চাষবাস ও বসতি বিস্তারে বাধা দেয়। তবে এই সকল অঞ্চলের বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব আঞ্চলিক সাংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে। মধ্য অক্ষাংশে মাঝারি উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের জন্য অর্থনৈতিক কাজকর্মের সুবিধা ঘন জনবসতি ও উন্নত অর্থনীতি গড়ে তুলেছে। ব্রিটেন সহ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি এজন্য এত ঘনবসতিপূর্ণ ও অগ্রসর। উচ্চ অক্ষাংশে তীব্র শৈত্যের জন্য চাষবাস করা যায় না। তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ চাষবাস বা বসতি স্থাপনের একেবারেই অনুকূল নয়।

[খ] সমুদ্র থেকে দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থান ঃ সমুদ্র থেকে দূরত্ব অনুযায়ী স্থলভাগের অবস্থান চার প্রকার হয়— (i) মহাদেশীয় (Continental) অবস্থান, (ii) সমুদ্র-প্রান্তিক (Littoral) অবস্থান, (iii) দ্বৈপ (Insular) অবস্থান এবং (iv) উপদ্বীপীয় (Peninsular) অবস্থান।

(i) মহাদেশীয় অবস্থান (Continental) ঃ সমুদ্র থেকে বহু দূরে মহাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকে মহাদেশীয় অবস্থান বলে। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এই দেশগুলিকে অন্য দেশের ওপর নির্ভর করতে হয় বলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ব্যাহত হয়। যেমন—নেপাল স্থলবেষ্টিত বলে দূরদেশে বাণিজ্যের জন্য নেপালকে ভারতের ওপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে নেপালের পণ্য আমদানি-রপ্তানি অনেকখানিই হয়। সুইজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ঘানা, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশগুলির অবস্থানও মহাদেশীয়।

(ii) সমুদ্র-প্রান্তিক অবস্থান (Littoral location) ঃ একদিকে বা দুইদিকে সমুদ্রোপকূল রয়েছে এমন দেশগুলিকে সমুদ্র-প্রান্তিক বা তটবর্তী অবস্থান বলে। বন্দর গড়ে তুলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এই দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নতি করে। জার্মানী, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড,নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশ তটবর্তী অবস্থানের সুফল ভোগ করে।

(iii) দ্বৈপ অবস্থান (Insular location) ঃ চারদিকে সমুদ্র ঘিরে আছে এরূপ দেশের অবস্থানকে দ্বৈপ অবস্থান বলে। সমুদ্রতটে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা হয় তেমনি মৎস্য সংগ্রহ, পর্যটন ব্যবসা ইত্যাদির মাধ্যমেও দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটে। জাপান ও ব্রিটেনের উন্নতির মূলে সমুদ্রপথে নৌবাণিজ্যের যোগাযোগ এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে মহাসমুদ্রে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে থাকা অনেক দ্বীপই এখনো আধুনিক সভ্যতার প্রভাব থেকে দূরে রয়েছে এবং স্থানীয় আঞ্চলিক সংস্কৃতি সম্পন্ন জীবনযাত্রা অনুসরণ করে চলেছে।

(iv) উপদ্বীপীয় অবস্থান(Peninsular location) ঃ তিনদিকে জলবেষ্টিত এবং একদিকে স্থলভাগ থাকলে এরূপ দেশকে উপদ্বীপীয় অবস্থান বলে। সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করে এই দেশগুলিও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়। ভারত, মালয়েশিয়া ও ইতালির উপদ্বীপীয় অবস্থান উল্লেখযোগ্য।

[২] ভূ-প্রকৃতি (Topography or Relief) ঃ

ভূমিরূপের প্রকৃতি সর্বত্র সমান নয়। কোথাও উঁচু পাহাড়, কোথাও মালভূমি, আবার কোথাও অবনমিত সমভূমি। ভূমিরূপকে (ক) পর্বত (খ) মালভূমি ও (গ) সমভূমি এই তিনভাগে আলোচনা করা যায়।

[ক] পর্বত (Mountains) ঃ ভূ-পৃষ্ঠ খুব উঁচু এবং বহুদূর বিস্তৃত হয়ে অবস্থান করলে তাকে পর্বত বলে। পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব উঁচু এবং উপত্যকার তলদেশ ও পাহাড়ের শীর্ষদেশের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য খুব বেশী হয়। পর্বতের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ পাহাড় অর্থাৎ পাহাড় স্বল্পোচ্চ এবং অল্প দূর বিস্তৃত।

অনেক দূর্গম পার্বত্য অঞ্চলে অধিবাসীগণ স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ করে নিজস্ব অর্থনীতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালী নির্বাহ করে চলেছেন এবং জীবনযাত্রায় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেকাংশে ধরে রেখেছেন। মানুষের জীবনযাত্রা বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ওপর পর্বত নানাভাবে প্রভাব ফেলে।

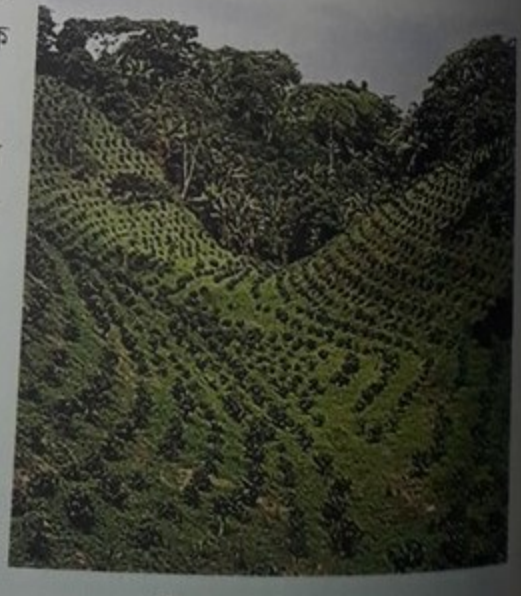

(i) বনজ সম্পদ ঃ পর্বত-ঢালে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টির জন্য ঘন বনভূমির সৃষ্টি হয়। কিন্তু বন্ধুর ভূ-প্রকৃতির জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে বনজ-দ্রব্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য।

(ii) পশুচারণ ঃ পার্বত্য অঞ্চলে বেশী উচ্চতায় ও বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের যেখানে তৃণভূমি জন্মায় সেখানে অধিবাসীগণ গরু, ভেড়া, ছাগল প্রতিপালন করে। পর্বতের উঁচু তৃণক্ষেত্রে শীলকালে বরফ জমে বলে অধিবাসীগণ পশুর পাল নিয়ে নীচে নেমে আসে এবং গ্রীষ্মকালে বরফ গলে গেলে পুনরায় উঁচু তৃণক্ষেত্রে উঠে যায়। একে ঋতু-নিয়ন্ত্রিত যাযাবর বৃত্তি বা Transhumance বলে। ভারতে কাশ্মীরে এরূপ দেখা যায়।

(iii) কৃষিকাজ ঃ পার্বত্য অঞ্চলে সমতলভূমির অভাব ও মৃত্তিকার উর্বরতা কম হওয়ায় কৃষিকাজ কেবলমাত্র নদী উপত্যকায় অথবা পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে হয়ে থাকে। ফলে খাদ্যফসল উদ্বৃত্ত হয় না বলে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ কম।

(iv) শিল্প ঃ পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে শিল্পের প্রসার ঘটে না। তবে কয়েক প্রকার সূক্ষ্ম ও নৈপুণ্য-নির্ভর শিল্প বা স্বল্প কাঁচামাল ব্যবহারকারী শিল্প (যেমন—কাশ্মীরে পশমজাত শিল্প, সুইজারল্যাণ্ডে ঘড়ি শিল্প ইত্যাদি) উন্নতি করতে পারে।

(v) পর্যটন ঃ পর্যটন গড়ে উঠলে পর্যটন ব্যবসা, স্থানীয় হস্তশিল্পের কেনাবেচার মাধ্যমে কিছু আর্থিক উন্নতি ঘটে। দার্জিলিং, উটি, শ্রীনগর, সিমলা, মুসৌরি, নৈনিতাল ভারতের উল্লেখযোগ্য পর্যটন ব্যবসায় কেন্দ্র।

(vi) জনবসতি ঃ বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, পরিবহন ব্যবস্থার অভাব ও জীবিকার সুযোগ সীমিত হওয়ায় জনবসতি কম। কেবল নদী উপত্যকায়, পর্বতের গায়ে স্বাভাবিক সমতল পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে জনবসতি গড়ে ওঠে।

(vii) যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ বন্ধুর ভূ-প্রকৃতিতে রাস্তাঘাট গড়ে তোলা কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হওয়ায় পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা অপ্রতুল। সমতলের সঙ্গে নিয়মিত যেগাযোগের অভাবে পার্বত্য অধিবাসীদের সংস্কৃতিতে এক স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

[খ] মালভূমি (Plateau) ঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যথেষ্ট উঁচু (অন্ততঃ ৩০০ মিটার) কিন্তু স্থানীয় বা আপেক্ষিক উচ্চতার পার্থক্য কম এরূপ ভূমিভাগকে মালভূমি বলে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের ওপর মালভূমির প্রভাব নিম্নরূপ ঃ

(i) বনজ সম্পদ ঃ মালভূমি অঞ্চলে ভূমিভাগ উঁচু নীচু এবং উর্বরতা কম হওয়ায় কৃষিকাজের প্রসার বিশেষ ঘটে নি। সেজন্য বনভূমি অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। কিন্তু খনিজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য পরিবহন ও শিল্পের উন্নতি ঘটেছে যে সকল জায়গায় সেখানে বন অনেকটাই ধ্বংস হয়েছে। বনভূমি থেকে বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন—মধু, মোম, রেজিন, কাগজশিল্পের জন্য বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

(ii) পশুচারণ ঃ মালভূমিতে বিস্তীর্ণ তৃণাঞ্চলে পশুপালনের মাধ্যমে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ করে। দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব অষ্ট্রিয়া, মধ্য এশিয়ার মালভূমি অঞ্চলে বহু অধিবাসী পশুচারণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

(iii) কৃষিকাজ ঃ মৃত্তিকার উর্বরতা কম বলে এবং ভূমিরূপ উঁচু-নীচু বলে কৃষিকাজের উন্নতি বিশেষ ঘটে না। তবে নদী অববাহিকায় ও মাঝে মাঝে সমতল ভূভাগে বা কিছু কিছু ভূভাগ সমতল করে বা ধাপ কেটে চাষ-আবাদ করা হয়।

(iv) খনিজ উত্তোলন ঃ মালভূমি অঞ্চল শিলাময় বলে খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এ কারণে খনিজ ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হলে কিছুটা ব্যয়সাধ্য হলেও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলে খনিজ উত্তোলন করা হয়। ভারতে ছোটনাগপুর মালভূমি লৌহ আকরিক, কয়লা, বক্সাইট, ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র প্রভৃতি উৎপাদনে ভারতে শীর্ষস্থানীয়। অষ্ট্রেলিয়ার সমভূমি সীসা, দস্তা ও সোনা, দক্ষিণ আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চল কয়লা, হীরে ও সোনা উত্তোলনে প্রসিদ্ধ।

(v) শিল্প ঃ মালভূমি খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার হওয়ায় বহু দেশেই মালভূমি অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রগুলিও অবস্থিত। ভারতে ছোটনাগপুর শিল্পবলয় একটি অগ্রণী শিল্পাঞ্চল।

(vi) পর্যটন ঃ পর্যটন শিল্প ও মালভূমিতে গড়ে ওঠে। উঁচু মালভূমি অঞ্চল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা শীতল এবং গ্রীষ্মকালে আরামদায়ক বলে পর্যটকদের জনসমাগম ঘটে। হোটেল ব্যবসা, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কিছু লোকের জীবিকার সুযোগ ঘটে।

(vii) জনবসতি ঃ সাধারণভাবে মালভূমি অঞ্চল জনবিরল হলেও যেখানে খনিজ-ভিত্তিক কাজকর্ম, শিল্পকেন্দ্র ও পর্যটন ব্যবসা গড়ে ওঠে সেই অঞ্চলগুলি ঘন-জনবসতিপূর্ণ হয়।

(viii) যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ পরিবহন ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা সমভূমি অঞ্চলের মত সহজে গড়ে তোলা না গেলেও বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

[গ] সমভূমি (Plains) ঃ উপরিভাগ প্রায়-সমতল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি অবস্থান, এরূপ ভূমিরূপকে সমভূমি বলে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলই নিম্ন-গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত।

(i) কৃষিকাজ ঃ সমভূমি কৃষিকাজের পক্ষে আদর্শ। নদীর পলল সঞ্চয়ের ফলে খুব উর্বর। সমভূমির বেশীর ভাগ অধিবাসীর উপজীবিকাই কৃষিকাজ। নদী গঠিত সমভূমিতে নদী থেকে জলসেচের সুযোগ থাকায় প্রচুর শস্যোৎপাদন করা হয়। ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অববাহিকা কৃষিকাজে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

(ii) শিল্প ঃ সমভূমি অঞ্চলে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব ঘটে না। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নদী অথবা সমুদ্র বন্দরের সুবিধা থাকলে কাঁচামাল আমদানি ও উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানির সুযোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষি, খনিজ ইত্যাদি নির্ভর শিল্প সমভূমিতে গড়ে ওঠে। কাজের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

(iii) জনবসতি ঃ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কাজকর্ম গড়ে ওঠায় প্রচুর জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কৃষি ও বসবাসের জমির প্রাচুর্য থাকায় জনবসতির ঘনত্ব খুব বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর প্রায় ৯০ শতাংশ লোক এই সমভূমি অঞ্চলেই বসবাস করে।

(iv) যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ ভূমিভাগের সমতা রেল ও সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে খুব সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পরিবহন ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বিকাশঘটে সমভূমিতেই। নদীগুলি সুনাব্য বলে নৌ-পরিবহনও উন্নত হয়। টেলি-কমিউনিকেশনের সুযোগও সবচেয়ে বেশী সমভূমিতেই।

[৩] আভ্যন্তরীণ জলভাগসমূহ (Inland Waterbodies) ঃ

মহাদেশের অভ্যন্তরে যে জলভাগ অর্থাৎ নদী, হ্রদ, খাল ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ জলভাগের অন্তর্গত। মানুষও তার পরিবেশে আভ্যন্তরীণ জলভাগের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল।

[ক] নদী (River) ঃ মানুষের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নদীর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন মানব সভ্যতা ছিল নদীকেন্দ্রিক। নীলনদের অববাহিকায় মিশরীয় সভ্যতা, গঙ্গা-সিন্ধু উপত্যকায় আর্য সভ্যতা,

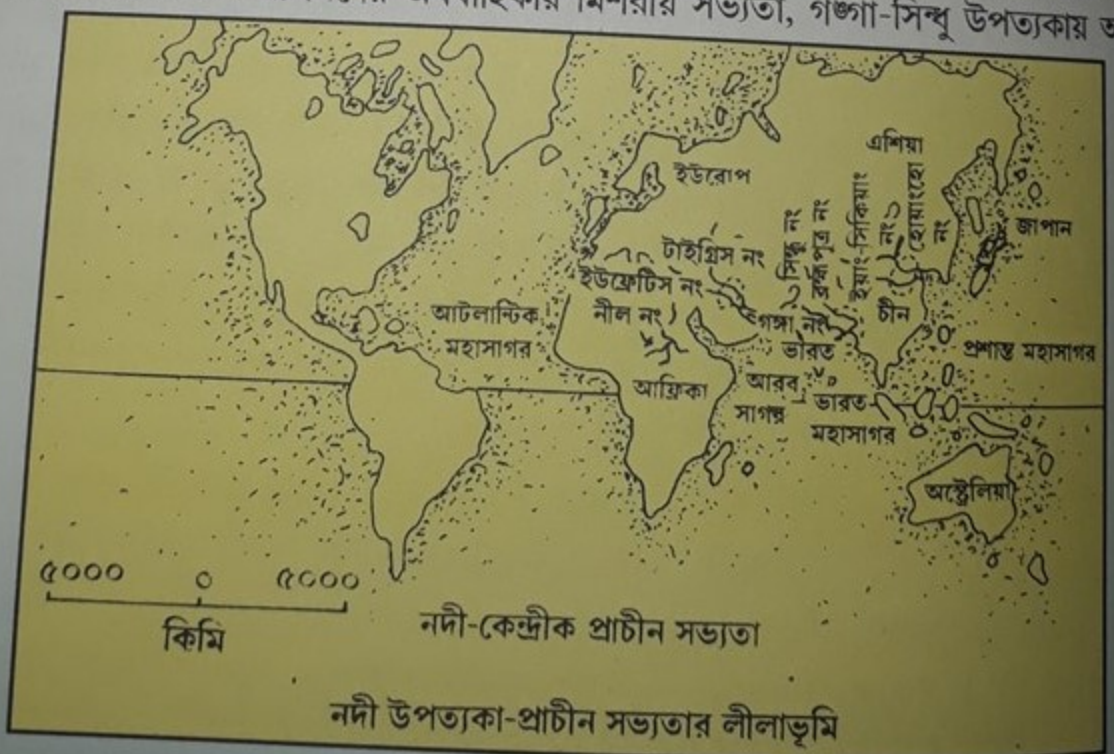

নদী উপত্যকা-প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি

টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিসের তীরে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা এবং হোয়াং হো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীরে চৈনিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সুপ্রাচীন কালে। বর্তমান যুগেও নদী উপত্যকাগুলি জনবহুল এবং কৃষি-শিল্প ইত্যাদি

(iii) দীর্ঘ উপকূলভাগ বরাবর উপকূলীয় বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে।

(iv) উপকূলীয় অঞ্চল বরাবর উষ্ণতার চরম ভাব কম থাকে।

(v) উপকূলের দৈর্ঘ্য বেশী হলে প্রতিরক্ষা সহজ হয়।

(vi) উপকূলভাগ সাধারণত অবনমিত হয় বলে উপকূলরেখা বরাবর উপকূল-সংলগ্ন সমভূমির সৃষ্টি হয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিবহণে উন্নত হয়।

[৫] জলবায়ু (Climate) ঃ

মানুষের জীবনে জলবায়ুর প্রভাব অপরিসীম। জলবায়ু বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

(i) কৃষিকাজে ঃ উপযুক্ত উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত না হলে কৃষিকাজ সম্ভব হয় না। কি কৃষি ফসল উৎপন্ন হবে তা জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে। কোন একটি অঞ্চলের খাদ্যাভ্যাস উৎপন্ন খাদ্য ফসলের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, মৌসুমী অঞ্চলের প্রধান উৎপন্ন ফসল হ'ল ধান এবং খাদ্যাভ্যাস চাল।

(ii) অরণ্য ও তৃণসৃষ্টিতে ঃ বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বনভূমির সৃষ্টি হয়। ক্রান্তীয় বৃষ্টিপাত যুক্ত অরণ্য এবং শীতপ্রধান স্থানে তৈগা বনভূমির মধ্যে যে পার্থক্য অথবা ক্রান্তীয় অঞ্চলের পর্বতের পাদদেশীয় বনভূমি ও পর্বতের উচ্চ অংশের সরলবর্গীয় বনভূমির মধ্যে যে পার্থক্য তা জলবায়ুর তারতম্যের জন্যই সৃষ্টি হয়। বনভূমিতে কাষ্ঠশিল্প গড়ে ওঠে এবং অন্যান্য বিভিন্ন বনজ উপজাত দ্রব্য সংগ্রহ করা হয়।

বৃষ্টিপাতের স্বল্পতায় তৃণভূমির সৃষ্টি হয়। তৃণভূমিতে দুধ, মাংস, পশমের জন্য পশুপালন করা হয়। প্রেইরী তৃণভূমিতে দুগ্ধ ও মাংস শিল্প, অষ্ট্রেলিয়ার ডাইন্‌সের তৃণভূমিতে পশমের জন্য মেষপালন উল্লেখযোগ্য।

(iii) শিল্পে জলবায়ুর প্রভাব ঃ জলবায়ু শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে।

(a) কৃষিজাত দ্রব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে সেই অঞ্চলে কি ধরণের শিল্প গড়ে উঠবে। আবার, এই কৃষিজাত দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ভর করে ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর উপর। এ কারণেই, পাট উৎপাদক অঞ্চলে পাটশিল্প, কার্পাস উৎপাদক অঞ্চলে কার্পাস বয়ন, রবার উৎপাদক অঞ্চলে রবার শিল্প স্থাপিত হয়। এই কৃষিজাত দ্রব্যগুলির উৎপাদন মূলতঃ জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

(b) শিল্পের জন্য বনজ কাঁচামালও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুরূপভাবে পশুচারণের জন্য তৃণভূমিও জলবায়ুর প্রভাবে গড়ে ওঠে। সুতরাং দুগ্ধ শিল্প, মাংস শিল্প, পশম শিল্প প্রভৃতি শিল্পগুলি পরোক্ষভাবে জলবায়ুর প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

(iv) শ্রমশক্তি ঃ শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বা নৈপুণ্য এবং শ্রমিকের সরবরাহ বসবাসের অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে যতটা সুলভ, প্রতিকূল জলবায়ু অঞ্চলে তা আশা করা যায় না।

(v) পরিবহন ব্যবস্থা ঃ অতি শীতল জলবায়ুতে নদীর জল বরফ হয়ে জমে যাওয়ায় শীতকালে নৌ-পরিবহণের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাটে রবফ জমে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করে। শুষ্ক জলবায়ুতে জলের অভাবে নদীপথে যাতায়াত সম্ভব হয় না। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে জলপথে পরিবহণের সুবিধা হয়। কিন্তু অতি বৃষ্টিতে বন্যা সৃষ্টি হলে পরিবহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

(vi) শক্তি সম্পদ ঃ শিল্প, কৃষিতে সেচ প্রভৃতির জন্য বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজন। এর একটি বড় অংশ আসে জলবিদ্যুৎ থেকে। বৃষ্টিবহুল জলবায়ুতে নদীখাত যথেষ্ট জল পেয়ে থাকে। বাঁধ দিয়ে নদীর জল আটকে খরস্রোত সৃষ্টি করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

(vii) মানুষের চাহিদা সৃষ্টি ঃ জলবায়ুর ভিন্নতায় মানুষের চাহিদাও ভিন্ন হয়। যেমন—শীতল জলবায়ু অঞ্চলে পশমবস্ত্রের চাহিদা, কিন্তু উষ্ণ ক্রান্তীয় অঞ্চলে চাহিদা সূতীবস্ত্রের। আর্দ্র ক্রান্তীয় অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষের খাদ্য তালিকায় মাছের চাহিদা বেশী, কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলে মাংসের চাহিদা বেশী।

(viii) বসতি ও বাসগৃহ ঃ মানুষের বসতি ও বাসগৃহের ওপরেও জলবায়ুর প্রভাব আছে। অতি শীতল তুন্দ্রা অঞ্চল, অতি শুষ্ক মরুভূমি, অতি আর্দ্র স্যাঁতস্যাঁতে বৃষ্টি অরণ্য বসবাসের অনুপযুক্ত। এই সকল অঞ্চল অতি জন-বিরল। কিন্তু উপক্রান্তীয় বা মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলে, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলিতে জনবসতি খুব ঘন।

বাসগৃহ নির্মাণ শৈলীতেও জলবায়ুর প্রভাব রয়েছে। এস্কিমোদের তৈরী শীতকালের বাসগৃহ ইগলু, মরু অঞ্চলে বালুঝড়ের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নির্মিত কোন্‌পা, ঝড়ে টিকে থাকতে পারে এমন শঙ্কু আকৃতির বাসগৃহ (অন্ধ্রপ্রদেশে), বৃষ্টিবহুল উত্তর-পূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলের স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে কাঠের খুঁটির ওপর বাঁশের চেচারীর দেওয়াল ও ঢালু খড়ের চালাঘর, মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত পশ্চিমবঙ্গের ঢালু ছাদবিশিষ্ট চালা এবং স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল বলে পাহাড়ের সমতল ছাদবিশিষ্ট মাটির বাড়ি মুখ্যত জলবায়ুর প্রভাবেই তৈরী হয়।

[৬] মৃত্তিকা (Soil) ঃ

মাটির গুণাগুণ বিচার কৃষির সাফল্যের জন্য করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন ধরণের জৈব ও রাসায়নিক পদার্থ থাকে বলে বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন ফসল ভাল হয়ে থাকে। যেমন—পলল মৃত্তিকা ধান ও পাট চাষে, কৃষ্ণ মৃত্তিকা তুলা ও গম চাষে, লৌহ-সমৃদ্ধ মৃত্তিকা চা চাষের পক্ষে উপযোগী।

(i) নদীর পলি গঠিত সমভূমির মৃত্তিকা এবং লাভা মিশ্রিত ক্ষয়জাত সমভূমির কৃষ্ণ মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলে এই দুই অঞ্চলে উক্ত ফসল (অর্থাৎ ধান, পাট, তুলা ও গম) এবং আরএ বিভিন্ন ফসল খুব ভাল হয়। মৃত্তিকা অল্প আম্লিক বা ক্ষারকীয় হলে উপযুক্ত সার ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন বাড়ানো হয়। জলসেচের সাহায্যে জলের অভাব পূরণ করলেও ফসল উৎপাদন বাড়ে।

(ii) কৃষিকাজ ছাড়াও মাটি ঘরের দেওয়াল ও মেঝে তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করা হয় আধুনিক বাসগৃহ তৈরীর জন্য, টালি তৈরী হয় গ্রাম ও শহরে নিম্নবিত্তের ঘরের চাল ছাওয়ার জন্য।

(iii) মাটি রাস্তাঘাট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা মাটি, মোরাম, ইট গুঁড়িয়ে খোয়া, ইট প্রভৃতি রাস্তা তৈরীর কাজে লাগে।

[৭] স্বাভাবিক উদ্ভিদ (Natural Vegetation) ঃ

মানুষের প্রয়োজনে স্বাভাবিক উদ্ভিদ নানা ভাবে কাজে আসে। যেমন ঃ

(i) উদ্ভিদের নরম ও শক্ত কাঠ দিয়ে আসবাব তৈরী হয়।

(ii) নরম কাঠ কাগজ ও বয়ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

(iii) পরিবহণ যানে বিশেষত সড়ক ও নৌযান নির্মাণে কাঠের ব্যবহার হয়।.
(iv) বনভূমি বন্যপ্রাণীর ও পাখীর আশ্রয় স্থান।
(v) অরণ্য কিছু মানুষেরও আবাসস্থল (বিভিন্ন আরণ্যক উপজাতি, যেমন—বান্টু, পিগমী, আন্দামানী প্রভৃতি)
(vi) বনভূমির উপজাতদ্রব্য (যথা মধু, মোম, রেজিন, লাক্ষা, বাদাম, আঠা, বনৌষধি প্রভৃতি) বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।
(vii) বিভিন্ন শিল্পে জ্বালানী হিসেবে কাঠের ব্যবহার হয়।
(viii) স্বাভাবিক উদ্ভিদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং বায়ুতে প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প মুক্ত করে বৃষ্টি ঘটাতে সাহায্য করে।
(ix) গাছ শিকড়ের মাধ্যমে মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে বলে মৃত্তিকা ক্ষয় হ্রাস পায়।

[৮] জীবজন্তু (Animals) ঃ

জড়শক্তি আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ পেশী শক্তির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। কৃষি, পরিবহন, যন্ত্র চালনায় পশুশক্তিই ব্যবহৃত হত।

খাদ্য ও পোষাকের প্রয়োজনেও মানুষ পশুর ওপর নির্ভরশীল ছিল। গবাদি পশুর দুধ ও মাংস খাদ্যের জন্য, মেষের পশম গরম পোষাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া পশুর চামড়া বিভিন্ন চর্মজাত দ্রব্য (যেমন— ব্যাগ, জুতো ইত্যাদি) প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

[৯] খনিজ (Minerals) ঃ

খনিজ সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের পরিধিকে প্রসারিত করে। বিভিন্ন শিল্পজগৎ গড়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

খনিজ দ্রব্য উত্তোলনকে কেন্দ্র করে একটি অখ্যাত অংশ ক্রম-শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে উন্নত জনপদে পরিণত হয়। বর্তমান জামসেদপুর শিল্প-শহরটি পূর্বের সাক্চি গ্রামটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভিলাই, বোকারো, দুর্গাপুর প্রভৃতিও আগে কৃষি-ভিত্তিক গ্রাম হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ দেশসমূহ খনিজ শিল্পজাত করে রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করেছে। এভাবে ব্রিটেন, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে।

শুধুমাত্র খনিজ তেল রপ্তানির ওপরেই আবর দেশগুলির অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ব বাণিজ্যে খনিজ তেলের মূল্যের ওঠানামা উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

সাংস্কৃতিক বা অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ (Cultural or Non-physical Environment) ঃ

মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির উপর সাংস্কৃতিক বা অ-প্রাকৃতিক পরিবেশ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিরূপ হবে তা প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, চিন্তাভাবনা অর্থাৎ তার কর্মসূচীকে নিয়ন্ত্রিত করে যে সকল উপকরণগুলি সেগুলির সমষ্টিকে। মুখ্য উপকরণগুলি হল— জনসংখ্যা, সমাজব্যবস্থা, জাতিগত গঠন, ধর্মীয় আচারাদি, শিক্ষা, ঐতিহ্য, সরকারী নীতি ইত্যাদি।

(i) জনসংখ্যা (Population) ঃ জনসংখ্যা মনুষ্যশক্তি শ্রমের যোগান দেয়। সুতরাং যে সকল দেশে উপযুক্ত জনবসতি রয়েছে সেখানে শ্রমের যোগানের অভাব হয় না। কৃষি, খনিজ, শিল্পকাজে শ্রমিকের প্রাচুর্যের ফলে উক্ত দেশে সম্পদ উন্নয়নের এক অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি হয়।